

যত মত তত পথ
হিন্দু ঐক্যের ভিত্তি



স্বামী মৃগানন্দ

'যত মত তত পথ'

হিন্দু ঐক্যের ভিত্তি

স্বামী মৃগানন্দ



শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন
যাদবপুর

প্রকাশিকা ঃ সন্ন্যাসিনী তপোময়ী পুরী
শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন
১, ইব্রাহিমপুর রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৩২
ফোন ঃ ৪১২-১৩৭২/০৭৬৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ কার্ত্তিক, কালিকা চতুর্দশী
2nd November, 1994
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ সারদা জন্মতিথি
29 December, 1999

মুদ্রাকর ঃ ভরত বৈদ্য
মিতা প্রিণ্টকো
৯, মন্মথনাথ গাঙ্গুলী রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০০২

পাঁচ টাকা

ভূমিকা

সহজ ভাবে সহজ কথা বলাই ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য। তবু তাঁর বাণীকে অনেকেই ভুল বোঝে, ভুল ব্যাখ্যাও করে। শ্রীঠাকুরের মহাবাণী 'যত মত তত পথ'-কে ঘিরে এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে ভ্রান্ত ধারণা।

এই ভুল ধারণার ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণকে হিন্দু-মুসলিম-খ্রীস্টান ইত্যাদি সর্বধর্মের সমন্বয়কারী বলা হয়ে থাকে। জননী সারদেশ্বরী সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, সর্বধর্মসমন্বয় বা অনুরূপ কোনও মতলব নিয়েই ঠাকুর জগতে আসেননি। তবু নিজেদের অজ্ঞানতাকেই আঁকড়ে থেকে আমরা ঠাকুরের মহাবাণীকেও বিকৃতভাবে গ্রহণ করেছি।

ঠাকুর 'যত মত তত পথ' এই মহাবাক্য বলেছিলেন যুগ প্রয়োজনে। তাঁর পার্ষদরা বলেছেন, সনাতন হিন্দুধর্মের জাগরণই ছিল সেই প্রয়োজন, যার জন্য ঠাকুরের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি হিন্দুধর্মের নানা মত ও পথের সাধনা করে প্রতিটি মত ও পথকেই পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী করেছেন এবং সেই সঙ্গেই হিন্দুধর্মের ঐক্যও প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এই প্রবন্ধে স্বামী মৃগানন্দ দেখিয়েছেন, ঠাকুরের ইসলাম ও খ্রীস্টধর্ম সাধনা বলে যা প্রচারিত হয় তা তাঁর বিশাল সাধনা সমুদ্রে সামান্য দু-একটি বুদ্বুদ মাত্র। তাঁর ইসলাম সাধনা আসলে সুফী মতের সাধনা। ঠাকুর খ্রীস্টানধর্মের সাধনা আদৌ করেননি। তিনি হিন্দুধর্মের সাকার ও নিরাকার, দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মতে সাধনা করেছেন ও সব হিন্দু-ধর্মমতই যে সত্য তা উপলব্ধি করেছেন।

অন্যদিকে, ঠাকুর এও দেখেছেন যে, ইসলাম বা খ্রীস্টধর্ম মতের সাধনায় হিন্দু দেবদেবী বাতিল হয়ে যান। কোনও মুসলমান বা খ্রীস্টান হিন্দু দেবদেবীকে সত্য বলে মানতে পারেন না। ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীরা সর্বধর্মসমন্বয়ের তত্ত্ব কদাপি স্বীকারও করেন না। তাঁরা একমাত্র আল্লা কিংবা গড ভিন্ন আর কোনও দেবতার অস্তিত্ব বরদাস্ত করেন না। তাঁদের মতে যীশুই একমাত্র ঈশ্বরপুত্র অথবা মহম্মদই শেষ রসুল। তাই হিন্দু দেবদেবী এবং অবতারবৃন্দকে অস্বীকার ও উপহাস করাই খ্রীস্টান এবং মুসলমানরা কর্তব্য মনে করেন। তাঁরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বা প্রফেট বলতে কোনও মতেই রাজি হবেন না। তথাকথিত সর্বধর্মসমন্বয় তত্ত্বকেও খ্রীস্টান ও মুসলমানরা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে থাকেন। কারণ, তাঁদের মতে একমাত্র তাঁদের নিজ নিজ ধর্মই সত্য, অন্য ধর্মাবলম্বীরা কাফের বা ভ্রান্ত।

ঠাকুরের 'যত মত তত পথ' মহাবাণীর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে এতকাল পর্যন্ত কোন বিচার বিশ্লেষণ হয়নি। স্বামী মৃগানন্দ এ বিষয়ে পথিকৃৎ। তিনি তাঁর পরিচ্ছন্ন চিন্তা, সুনির্দিষ্ট বক্তব্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় ঠাকুরের মহা নির্দেশের স্বরূপটি তুলে ধরেছেন। স্বামীজীর এই ব্যাখ্যার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ, এতে আমাদের জাতীয় মহাভ্রান্তিরও নিরসন ঘটবে।

স্বামীজির বক্তব্য অধ্যাত্ম তত্ত্ব ও তার সাধন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে বক্তব্য যুক্তি ও বিচারের সাহায্যে হয়েছে দৃঢ়ীকৃত।

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক আক্রমণ চলছে তার প্রতিরোধও এখন একান্ত প্রয়োজন। মিথ্যা কুহক কাটিয়ে

আমরা সত্য পথ বরণ না করলে হিন্দুধর্মের মহা বিপদ দেখা দেবে। বহুদিন আগে স্বামী বিবেকানন্দ সে সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন। এই পুস্তিকা সত্য পথের দিশা দেবে বলে বিশ্বাস করি।

গাঙ্গুলি বাগান
কলকাতা-৮৪

পবিত্রকুমার ঘোষ

প্রকাশিকার নিবেদন
দ্বিতীয় সংস্করণ

তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার নামে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথ' মহাবাণী নিয়ে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তারই নিরসন কল্পে লেখক ঠাকুরের মহাবাণীটির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন গভীর বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে। পুস্তিকাটি পাঠকবর্গের বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। ঠাকুরের 'যত মত তত পথ' মহাবাণীর যথার্থ তাৎপর্য যাতে সকলে অনুধাবন করতে পারে তারই মহতী প্রচেষ্টা স্বরূপ রামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর একটি পত্রের মূল্যবান উদ্ধৃতির সংযোজন সহ পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা সানন্দে প্রকাশ করলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণসত্যানন্দার্পণমস্তু।

'যত মত তত পথ' হিন্দু ঐক্যের ভিত্তি

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজস্ব উপলব্ধি প্রসূত একটি মহাবাণী 'যত মত তত পথ।' এই বাণীটিকে ইদানীং বিপুলভাবে প্রচার করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে—'যত মত তত পথ' মানে হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম সব এক। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ইত্যাদি ধর্মমতকে এক জ্ঞান করেই নাকি এই বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্ম ইসলামধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম মতে সাধনায় সিদ্ধ হয়েই নাকি এই বাণীতে সব ধর্মমতকে সমান বলে ঘোষণা করেছিলেন।

তাঁর হিন্দুধর্মের সাধনার সঙ্গে ইসলামধর্ম ও খ্রষ্টানধর্ম সাধনার কথা প্রায় অনিবার্যভাবে একসঙ্গে বলাটা এখন বলতে গেলে স্বাভাবিক রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। এমনভাবে বোঝানো হচ্ছে যাতে মনে হবে, ঐ তিন ধর্মের সাধনায় তিনি প্রায় সমান সমান সময় ও শ্রম নিবেদন করেছিলেন।

কিন্তু যদিও আদতে অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের সারাজীবনের হিন্দুনিষ্ঠ সাধনা-সম্পৃক্ত একান্ন বৎসরের জীবনের মাত্র তিনদিন হচ্ছে সুফী মতের সাধনা এবং তিনদিন খ্রীষ্টভাবের আবিষ্ট অবস্থা। এ-দুটোকে যে পরিমাণ গুরুত্ব দিয়ে অপপ্রচার করা হচ্ছে তাতে প্রচারকদের উদ্দেশ্য বিষয়ে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচরিত ও বাণীকেন্দ্রিক প্রামাণ্য মুদ্রিত গ্রন্থের হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে তিন-চার পৃষ্ঠা মাত্রই ঐ দুই তথাকথিত ইসলাম ও খ্রীষ্টান সাধনার জন্য বরাদ্দ হয়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক। এর কারণটা অবশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে যখন আমরা এই দুই তথাকথিত সাধনার বিবরণ বিশ্লেষণ করবো।

কিন্তু ইদানীং আবার শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় মাপকাঠিও ঐ একটাকেই ধরা হচ্ছে যে, তিনি ইসলাম সাধন করেছিলেন। একশ্রেণীর হিন্দু, উদারতার প্রমাণ দেওয়ার এক অজ্ঞাত তাগিদে, তাঁকে অহিন্দু বানিয়ে দেওয়ারই উপক্রম করছেন। তাঁরই নামাঙ্কিত কোন প্রতিষ্ঠান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের অহিন্দু বলে ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেন নি। এর প্রভাব শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তিতে কিছুটা পড়ছে বই কি। সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই বেশ বিভ্রান্ত হচ্ছেন এবং শ্রদ্ধাও হারিয়ে ফেলছেন এটা আমরা লক্ষ্য করছি। আবার কোন কোন খ্যাতনামা লেখক তথাকথিত সর্বধর্মসমন্বয়কারীদের তীব্র সমালোচনা করতে গিয়ে রামকৃষ্ণদেবের ভাবমূর্তিকেই নামিয়ে ফেলছেন, তা ভাষার দৈন্যেই হোক কিংবা যথার্থ শ্রদ্ধার অভাবেই হোক।

কিন্তু ভাববার কথা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ মহাবাণীর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, সেটা কি আদৌ ঠিক? সত্যিই কি শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু-মুসলমান খ্রীষ্টান এই তিন ধর্মের সাধনা করে ঐ বাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন? যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, যিনি চৈতন্য, তিনিই স্বয়ং ভগবান রামকৃষ্ণ। তাঁর বাণী বেদবাণী। অতএব 'যত মত তত পথ' বলতে তিনি ঠিক কি বুঝিয়েছেন সেটা যথার্থ বুঝতে গেলে একটু গভীরে গিয়ে দেখতে হবে।

প্রথমেই দেখা দরকার শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোন্ সময়ে অর্থাৎ সাধনার কোন্ অবস্থায় সর্বপ্রথম এই বাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন। ঐ ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে চিহ্নিত করলেই মূল কথাটি মূলতঃ স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধক ভাবের প্রথম দিকে দেখা যায় তীব্র ব্যাকুলতার সাধনা। এই তীব্র ব্যাকুলতা তাঁকে করেছে উন্মাদবৎ।

তিনি চরম ব্যাকুলতা নিয়ে মা ভবতারিণীকে ডাকতেন। ঠিক যেন মা হারা ছেলে। মায়ের জন্য পাগলের মতো কাঁদছেন। এটি ছিল রাগানুগা ভক্তির চরম সাধনা, ভক্তির এক অভিনব অধ্যায়। চিন্ময়ী মা শ্রীরামকৃষ্ণের 'মাথাকাটা' তপস্যায় সাড়া দিয়ে বাঁধা পড়ে গেলেন চিরকালের মতো। চিন্ময় মাতৃবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ হ'তে নিঃসৃত জ্যোতির সমুদ্র দর্শন করে তাতে নিমজ্জিত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই জ্যোতির্ময়ী মাকে কেন্দ্র করে তিনি লাভ করলেন দিব্যতম মাতৃভাবের চরম অবস্থা। মা ভবতারিণী হয়ে গেলেন তাঁর নিত্যদিনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গী। মায়ের সঙ্গে চলতে লাগলো বহু কথা বহু লীলা।

তারপর দক্ষিণেশ্বরে এলেন সিদ্ধা সাধিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণী। তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রহণ করলেন তন্ত্রপথের দীক্ষা। ভৈরবী এমন বিরাট আধার পেয়ে তাঁর সিদ্ধির সবটুকু উজাড় করে শ্রীরামকৃষ্ণকে করালেন চৌষট্টি তন্ত্রের সাধনা। বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ সাধনায় চরম সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হলেন অনায়াসেই। তন্ত্রের দিব্যাচারকে করলেন মাতৃভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বামাচারের পথকে নিরুৎসাহিত করলেন।

এলেন জটাধারী নামক এক রামাইত সাধক। তাঁর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ নিলেন রামাইত সাধন। রামলীলার বিগ্রহকে নিয়ে চললো নানা লীলা। বিগ্রহ জীবন্ত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার জগৎকে ভরিয়ে দিতে লাগলো চরম প্রাপ্তির আনন্দে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণব তন্ত্রমতে মধুর ভাবে সাধনা করলেন। ছয়মাস ধরে স্ত্রীবেশ ধারণ করলেন। সে সময় রাধাভাবে বিরহজ্বালা সহ্য করেছেন, অঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে অদ্ভুত সব সাত্ত্বিক বিকার। মহাভাবে তন্ময় হয়েছেন।

তারপর রূপরসযুক্ত ভক্তিভাবের মধুর সাম্রাজ্য থেকে হঠাৎ তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন জ্ঞানমার্গী সাধক তোতাপুরী। তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে এসে অবাক হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখে। ভাবতে পারেননি সরস বঙ্গভূমিতে পাবেন কঠিন যোগমার্গের এমন আধার। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দিলেন বেদান্তের অদ্বৈত সাধনার দীক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সিদ্ধ অবস্থায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানে বসে তিনি রূপের রাজ্য অতিক্রম করে নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। পরপর তিনদিন ঐরকম জড়বৎ স্থির হয়ে রয়েছেন দেখে তোতাপুরীও অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। ওঁকার ধ্বনির মধুর উচ্চারণের সাহায্যে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনলেন তাঁর মনকে। নির্বিকল্প অবস্থায় আরোহণ করে অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভারতোদ্ভূত হিন্দুধর্মান্তর্গত বহুবিধ ধর্মমার্গের বিভিন্নভাবের সাধনার শেষে অদ্বৈতভাবের চরম অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েই ঘোষণা করেছিলেন—**'যত মত তত পথ'**। কারণ, এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার সাধনাতে তিনি যে চরম তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন, সে সবই ঐ এক অদ্বৈতভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছে সগুণ নির্গুণ সাকার নিরাকার সব এক হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রকৃত সাধনভজনের সর্ববিধ পথ ঐ এক স্থানেই নিয়ে যায়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে' এই বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখছেন—

"অদ্বৈত ভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুরের এইকালে আর একটি বিষয়েরও উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য।

কারণ, ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া তিনি ইতঃপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে। অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি সেইজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেন, 'উহা শেষ কথা রে শেষ কথা, ঈশ্বর প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্বশেষে উহা সাধকজীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়; জানিবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ।' ঐরূপে অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া ঠাকুরের মন অসীম উদারতা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বরলাভকে যাহারা মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া শিক্ষা প্রদান করে ঐরূপ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি উহা এখন অপূর্ব সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল।...... এখন হইতে তিনি ধর্মের একদেশী ভাব অপরে অবলোকন করিলেই প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ হীনবুদ্ধি দূর করিতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইতেন।"

অতএব এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ভারতে উদ্ভূত হিন্দুধর্মের বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন মতের সাধনায় রামকৃষ্ণদেব যে চরম অবস্থা লাভ করেন, সেখানে ঐ সব হিন্দু মত পথ এক হয়ে যায়। মন তখন প্রতিষ্ঠিত হয় ভূমায়। ভূমার সেই বিরাটত্ব, সেই অসীমত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তঃকরণকে করে দেয় পরম উদার। ঐ সময়, যে সব ধর্মমত ঈশ্বরলাভকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে শিক্ষা দেয়, সেই সব সমভাবাপন্ন ধর্মসম্প্রদায়গুলিকে তিনি উদার সহানুভূতির বশে একসূত্রে বেঁধে দিলেন। হিন্দুদের নিজেদের মতপথের মধ্যে চিরাচরিত যে বিবাদ বিভেদ রয়েছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যে একপেশে গোঁড়ামির মনোভাব রয়েছে, সেসব ভিত্তিহীন, অথচ অকারণ ঝগড়া করে তারা পরস্পর থেকে দূরে সরে থাকছে, এটা তিনি মেটাতে

চাইলেন তাঁর নিজস্ব উপলব্ধিপ্রসূত সহজ উদার ঘোষণার মাধ্যমে। একথার প্রমাণ কথামৃতের বহুস্থানে বহুভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এই উদার ঘোষণার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ঘূণাক্ষরেও জানতেন না ইসলাম সাধনা বা খ্রীষ্টান সাধনার কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের তথাকথিত ইসলাম এবং খ্রীষ্টসাধনার ঘটনার প্রাদুর্ভাব হয়েছে ঐ মহাবাণী উচ্চারণের অনেক পরে। এতএব ঐ মহাবাণী শুধুমাত্র হিন্দুধর্মের মহাসমন্বয়ের বাণী, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সমন্বয়ের বাণী নয়—এটা পরিষ্কার বোঝা যায়।

লীলাপ্রসঙ্গে সারদানন্দ মহারাজ লিখছেন—"অদ্বৈত বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঠাকুরের মন এখন কিরূপ উদার ভাবসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা আমরা এইকালের একটি ঘটনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি।······ঐ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইবার পর ঠাকুর কয়েক মাসের জন্য রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সেই ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পরে উল্লিখিত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।" অদ্বৈতজ্ঞানের নির্বিকল্প অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর ছয়মাস ধরে ঠাকুরের কিছু রোগ ভোগ হয়। তারপর ঠাকুর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। ঐ সময় দক্ষিণেশ্বরে আসেন সুফী সাধক গোবিন্দ রায়। ইনি আদতে ছিলেন ক্ষত্রিয়, পরে ইসলামের সুফী সম্প্রদায়ের প্রচলিত শিক্ষা ও ভাবসহায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করার পদ্ধতি তাঁর হৃদয় অধিকার করেছিল। কারণ, ঐ সম্প্রদায়ের দরবেশদের মতো তিনি ভাবসাধনে নিযুক্ত থাকতেন।

এই গোবিন্দ রায়কে দেখে ঠাকুরের মনে উঠলো ঐ মতে সাধনার কথা। লীলাপ্রসঙ্গের বিবরণে পাই—"তিনি ভাবিতে থাকেন, 'ইহাও তো ঈশ্বরলাভের এক পথ, অনন্তলীলাময়ী মা এ পথ দিয়াও তো কত লোককে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মলাভে ধন্য করিতেছেন। কিরূপে তিনি

এই পথ দিয়া তাঁহার আশ্রিতদিগকে কৃতার্থ করেন, তাহা দেখিতে হইবে। গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া এই ভাবসাধনে নিযুক্ত হইব।······দীক্ষাগ্রহণ করিয়া যথাবিধি ইসলামধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ঐ সময় আল্লা জপ করিতাম, মুসলমান-দিগের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়িতাম এবং হিন্দুভাব মন হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দু দেবদেবীকে প্রণাম দূরে থাকুক, দর্শন পর্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ঐভাবে তিন দিবস অতিবাহিত হইবার পরে ঐ মতের সাধনফল সম্যক হস্তগত হইয়াছিল। ইসলামধর্ম সাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীর্ঘশ্মশ্রু বিশিষ্ট সুগম্ভীর জ্যোতির্ময় পুরুষপ্রবরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। পরে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধিপূর্বক তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্মে তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছিল।"

এই তথাকথিত ইসলামসাধনার সময় বিশেষভাবে লক্ষণীয় হচ্ছে, —ঠাকুরের মন থেকে হিন্দুভাব এককালে লুপ্ত হওয়া এবং দেবদেবীকে দর্শন পর্যন্ত করতে অনীহা। আল্লা মন্ত্র জপ এবং তিনবার নমাজের এই অনিবার্য ফল খুবই স্বাভাবিক। ইসলাম ধর্মে বলা আছে, আল্লার কোন শরিক নেই। আল্লা একা, তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে একাসনে বসানো যাবে না। দেবদেবীর মূর্তিপূজা ঘোর পাপ। মূর্তিপূজকরা কাফের। তাই সত্যস্বরূপ সরল সহজ শিশুভাবময় ঠাকুরের চিত্তে মূল ইসলামের এই তত্ত্ব সাময়িকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ঐ তিনদিন মাত্র সামান্য আকারে ইসলাম ভাবসাধন করতে গিয়ে।

এর একটা স্পষ্ট অর্থ এটাও দাঁড়ায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তথাকথিত ঐ ইসলাম সাধনার প্রভাবে প্রকৃতপক্ষে সাময়িকভাবে অনুভব করেছিলেন যে, সব মতই পথ নয়। কারণ, ইসলাম মতে দেবদেবীর

মূর্তিপূজা অভীষ্ট লাভ করাতে পারে না। তাই দেবদেবীর পূজা তো অনেক দূরের কথা, প্রণাম বা দর্শনের প্রবৃত্তিও হয় নি। অর্থাৎ যেহেতু ইসলাম ধর্ম নিজ মত ছাড়া অন্য কোনও মতকে মান্য করে না, সেহেতু ভারতের হিন্দুধর্মের দেবদেবীর পূজক এবং নিরাকারের উপাসক ইত্যাদি অসংখ্য মতপথের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তা ঐ ইসলামের প্রভাবে সাময়িকভাবে মিথ্যা হয়ে গেল। সাধনার ঠিক সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলতে বললে তাঁকে হয়তো বলতে হ'ত—যত মত তত পথ নয়, একমাত্র ইসলামই পথ। খুব রক্ষা, তা হয়নি। কারণ, তিনি বস্তুতঃ হিন্দু সাধকের মতই ইষ্টলাভের সাধনা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গেই আর একটা দিক নিয়ে ভাবার আছে। ইসলাম সাধনার তিনদিনের শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন করলেন এক দীর্ঘশ্মশ্রু-বিশিষ্ট সুগম্ভীর জ্যোতির্ময় পুরুষপ্রবরকে। ইসলাম ধর্মে রূপের কোনও স্থান নেই, স্বীকৃতিও নেই। তবে এই যে রূপময় দর্শন এটা কি ইসলাম-সিদ্ধ হতে পারে? কখনই নয়। কারণ, ইসলামধর্মে ঐরূপ কোনও দর্শন বা সিদ্ধির মান্যতা নেই। এর পরই দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধি করছেন এবং ক্রমে তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্মে তাঁর মন লীন হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ তাঁর এই সিদ্ধিলাভ অবশ্যই হিন্দুধর্মেরই সিদ্ধি।

এই নির্গুণ ব্রহ্মে পুনরায় এসে পড়েছে সেই অদ্বৈতভাবভূমির অবস্থান। সেখানে আবার এসে পড়েছে অসীম উদারতা। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ, প্রথমতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণ স্বধর্মনিষ্ঠায় সুপ্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়তঃ, তিনি সাধনা করেছেন সুফী মতে। সুফীদের সাধনা সাধারণতঃ হিন্দুদের সাধনার সঙ্গে খুবই সাদৃশ্যযুক্ত। সেখানে

ব্রহ্মচর্য ত্যাগ তপস্যা সহায়ে ঈশ্বরকে পাওয়ার উদ্দেশ্য আছে, আকাংক্ষা আছে। তাই সুফীদের মধ্যে দেখা যায়, বহু সিদ্ধ সাধক পীর দরবেশ ফকির গোসাঁই ইত্যাদি নামে বিচরণ করেন। তাই সিদ্ধ অবস্থায় আবার যখন অদ্বৈতের অসীম উদারতায় মন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন তাঁর ধারণা হয়েছে, এভাবেও মা কৃপা করেন। অতএব এই তথাকথিত ইসলাম সাধনা কখনই ইসলাম সাধনা নয়, প্রকৃতপক্ষে নামান্তরে হিন্দু সাধনা।

হিন্দুধর্মের যে কোনও একটি মত বা পথে একই পূর্ণতা এবং একই আনন্দ প্রেম সহানুভূতি উদারতা পরিদৃষ্ট হয়, কারও মান্যতার প্রতি ঘৃণা উৎপন্ন হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বধর্মে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ বলেই ইসলামের অতি সাময়িক প্রভাব তাঁর আসল সত্তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। দেবদেবীর প্রতি অতি সাময়িক বিরূপতা চরম অবস্থায় গিয়ে আপনিই কেটে গেছে।

সুফী গোবিন্দ রায় মুসলমান বেশধারী হলেও বস্তুতঃ ছিলেন হিন্দুদের সাধনমার্গেরই অনুসারী। শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ তিনদিনের সাধনায় প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দ রায় প্রমুখ বিশিষ্ট সুফীদের অনুসৃত পথ ঈশ্বরলাভের পথ বলে চিহ্নিত ও স্বীকৃত হয়েছে, মূল এবং সমগ্র ইসলাম নয়। অতএব শ্রীঠাকুরের 'যত মত তত পথ' উক্তিটিকে মূল ইসলামের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়াটা নিতান্তই ভুল কাজ।

এ বিষয়ে স্বামী সারদানন্দ নিজের মন্তব্যও দিয়েছেন—"বেদান্ত-সাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মন অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্বোক্ত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায় এবং একমাত্র বেদান্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে ভারতের হিন্দু এবং মুসলমানকুল পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইতে

পারে, একথাও হৃদয়ঙ্গম হয়। নতুবা ঠাকুর যেমন বলিতেন, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্বত-ব্যবধান রহিয়াছে—পরস্পরের চিন্তাপ্রণালী, ধর্মবিশ্বাস, ও কার্যকলাপ এতকাল একত্রবাসেও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে।—ঐ পাহাড় যে একদিন অন্তর্হিত হইবে এবং উভয়ে প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে, যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমানধর্ম সাধন কি তাহারই সূচনা করিয়া যাইল ?"

যাঁরা ইসলামের গ্রন্থ এবং ইতিহাস অনুধাবন করেছেন তাঁরা সহজেই বুঝতে সক্ষম হবেন যে, মুসলমানকুলের পক্ষে 'একমাত্র বেদান্ত-বিজ্ঞানে বিশ্বাসী' হওয়া কখনই সম্ভব নয়, যদি তারা তাদের ইসলামধর্মকে বজায় রাখে। ইসলামধর্মকে ধরে রাখতে গেলে তাদের একইসঙ্গে পূর্ণ ইমান আনতে হবে কোরানের ওপর, আল্লার ওপর এবং আল্লার একমাত্র ও শেষ রসুল মহম্মদের ওপর। অন্য কোনও মতপথ অনুসারী হওয়া চলবে না। অর্থাৎ বেদান্ত বিজ্ঞানে বিশ্বাসী হতে গেলে তাদের ঐ পূর্ণ ইমান ত্যাগ করতে হবে। এমনটি কোনও দিন হতে পারে – এই আশার ছলনায় বিমোহিত হয়ে হিন্দুরা কালযাপন করতে পারে, কিন্তু সত্যিকার ইমানদার মুসলমানকুল কোনওকালে স্বধর্মত্যাগ করে বেদান্তবিজ্ঞানের মার্গে দীক্ষিত হবে—এটা সাধারণ-ভাবে তারা কল্পনাও করতে পারে না।

অতএব সর্বদিক থেকে খতিয়ে দেখলে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি 'যত মত তত পথ' মূল ইসলামধর্মকে জড়িয়ে নয় এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণও ঐ উক্তিকে নিজেদের সঙ্গে জড়িয়ে মেনে নিতে পারেন না, কারণ, সেটা তাঁদের শাস্ত্র নির্দেশ বিরুদ্ধ।

হিন্দুধর্মান্তর্গত প্রধান কয়েকটি সাধনমার্গের বহুবিধ ভাবসাধনায় চরম অবস্থা লাভ করার প্রায় ছয় মাস পর সুফী সাধনায় সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তারও এক বছর পর উপস্থিত হয়েছে তথাকথিত খ্রীষ্টান সাধনার ঘটনা। তথাকথিত বলা হচ্ছে এইজন্য যে, খ্রীষ্টান ধর্মে ঠাকুরের কোনও আনুষ্ঠানিক দীক্ষা বা ব্যাপ্‌টাইজিং হয়নি। কোনও বিশেষ বিধি বা মার্গ অনুসরণ করে কোনও সাধনাও করেননি যাকে বলা যায় খ্রীষ্টধর্ম সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণের খ্রীষ্টান সাধনা নামে যা প্রচারিত হচ্ছে তা আসলে কোনও সাধনা নয়, শুধুমাত্র একটা ভাবাবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে যে বর্ণনা আছে তা অনুধাবন-যোগ্য। স্বামী সারদানন্দ লিখছেন—"এই কালের এক বৎসর পরে কিন্তু ঠাকুরের মন আবার অন্য এক সাধনপথে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দর্শন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। তখন তিনি শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে বাইবেল শ্রবণপূর্বক শ্রীশ্রীঈশার পবিত্র জীবনের এবং সম্প্রদায় প্রবর্তনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। ঐ বাসনা মনে ঈষন্মাত্র উদয় হইতে না হইতে শ্রীশ্রীজগদম্বা উহা অদ্ভুত উপায়ে পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, সেই হেতু উহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় নাই।"

ঘটনার উৎসস্থল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির কাছে যদুমল্লিকের বাগানবাড়ী। ঠাকুর সেখানে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন। বৈঠকখানার দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল মাতা মেরীর কোলে শিশু যীশুর ছবি। ঠাকুর সেদিন তন্ময় হয়ে ঐ ছবিটি দেখছেন আর যীশুর কথা ভাবছেন। এমন সময় ছবিটি তাঁর সামনে জীবন্ত জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো এবং

সেই জ্যোতিঃরশ্মি তাঁর অন্তরে প্রবেশ করলো। সেই মুহূর্তে ঠাকুরের জন্মগত হিন্দুসংস্কার বিলীন হয়ে গেল এবং বিজাতীয় সংস্কার অন্তরকে গ্রাস করলো। তখন দেবদেবীর প্রতি ঠাকুরের অনুরাগ ভালবাসা সব হারিয়ে গেল। যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁর পারিষদ পাদরীদের প্রার্থনামন্দির ইত্যাদির দর্শন হতে লাগলো ভাব-তন্ময় অবস্থায়। শ্রীশ্রীজগন্মাতার মন্দিরে যাওয়ার কথা ভুল হয়ে গেল। তিনদিন ঐ ভাবতরঙ্গ ঠাকুরকে আবিষ্ট করে রাখলো। তারপর পঞ্চবটীতে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন, একজন সুন্দর গৌরবর্ণ অপরিচিত দেবমানব তাঁর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছেন। লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে "ঠাকুর দেখিয়াই বুঝিলেন ইনি বিদেশী এবং বিজাতিসম্ভূত। দেখিলেন, বিশ্রান্ত নয়নযুগল ইঁহার মুখের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে এবং নাসিকা একটু চাপা হইলেও উহাতে ঐ সৌন্দর্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম সাধিত হয় নাই। ঐ সৌম্য মুখমণ্ডলের অপূর্ব দেবভাব দেখিয়া ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং বিস্মিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—কে ইনি? দেখিতে দেখিতে ঐ মূর্তি নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকুরের পূত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ঈশামসি'।...তখন দেবমানব ঈশা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীরে লীন হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ঠাকুরের মন সগুণ বিরাট ব্রহ্মের সহিত কতক্ষণ একীভূত হইয়া রহিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর এই দর্শনের পর ঈশাকে অবতার বলে মেনেছেন, সেটা আলাদা কথা। আমাদের একটু তলিয়ে দেখতে হবে ঐ তথাকথিত খ্রীষ্টান সাধনার বিষয়টিকে। দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ নূতন নূতন ভাবে চাইছেন শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন। সে আকাংক্ষা পূর্ণ হচ্ছে কখনও মাতৃরূপ দর্শনে, কখনও সগুণব্রহ্মের সঙ্গে একাকারিত্বে, কখনও

নির্বিকল্প নির্গুণ নিরাকার অবস্থায়। এর কোনওটাই খ্রীষ্টান মতের উপলব্ধির বস্তু নয়।

ঠাকুর মেরী এবং যীশুকে দেখছেন তন্ময় হয়ে। সেখান থেকে জ্যোতিঃরশ্মি অঙ্গে প্রবেশ করায় তিনি ভাবস্থ হলেন এবং সেই ভাব তিন দিন স্থায়ী হোল। সে অবস্থায়, ইসলাম সাধনার সময় যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনই, দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা বিলুপ্ত হোল। এর কারণ, খ্রীষ্টানরা দেবদেবী মানে না, হিন্দুদের বলে পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা তাদের দৃষ্টিতে অধর্ম এবং কুসংস্কার। তাই ঐ বিজাতীয় ভাবাবেশে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার মন্দিরেও যাচ্ছেন না। তাহলে বলা যায়, ইসলাম সাধনার সময় যেমনটি হয়েছিল, ঠিক তেমনিই ঐ সময়টিতেও ঠাকুরের কাছে প্রতিভাত হয়েছে—যত মত তত পথ নয়। কারণ, খ্রীষ্টান মতে দেবদেবীর পূজা কখনই অভীষ্ট লাভ করাতে পারে না। বাইবেল গ্রন্থে খ্রীষ্টান ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী মোসেস্ থেকে যীশু পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতিনিধি কিংবা পুত্রের মুখে ব্যক্ত হয়েছে। সর্বত্র একই ভাব—প্রফেট এবং তাঁর গড্ ছাড়া অপর কারও মত বা পথে বিশ্বাস রাখা চলবে না। একমাত্র প্রফেটই পরিত্রাতা। গড্ তাঁর একমাত্র প্রতিনিধি বা একমাত্র পুত্রের মাধ্যমেই মানুষকে তাঁর বাণী শুনিয়েছেন। সেখানে অন্য কারও স্থান নেই। ইসলামের মতোই খ্রীষ্টানদের ঈশ্বরও অপর কাউকে তাঁর পাশে সহ্য করতে পারেন না। আর একমাত্র প্রফেট ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে ঈশ্বর কথা কইতেও পারেন না। অতএব খ্রীষ্টান মত ছাড়া অন্য মত কী করে পথ ব'লে গ্রাহ্য হবে? তাই দেবদেবীর মন্দির সাময়িকভাবে পরিত্যাজ্য হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ খ্রীষ্টান ভাবাবেশের সময়।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ লাভ করলেন ঈশার দর্শন এবং ক্রমে ব্রহ্মের

সঙ্গে একীভূত হ'য়ে সমাধিস্থ হলেন। এই সমাধি বা চরম অবস্থা হিন্দুমতের উপলব্ধি। অর্থাৎ সেই অদ্বৈততত্ত্বের ভূমিতে অধিষ্ঠিত হয়ে আবার মন হয়ে যাচ্ছে ভূমার স্বরূপ। আবার মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে এসে বলতে পারছেন উদারতার কথা, বিশ্বপ্রেমের কথা। অর্থাৎ যত মত তত পথের উক্তি সমগ্র খ্রীষ্টানধর্মকে জড়িয়ে নয় এবং খ্রীষ্টানধর্মাবলম্বীগণও ঐ উক্তিকে নিজেদের সঙ্গে জড়িয়ে মেনে নিতে পারেন না কারণ, সেটা হবে তাঁদের স্বধর্মবিরুদ্ধ।

অতএব এতক্ষণের আলোচনায় এটা স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, সময়ের নিরিখে এবং যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের নিরিখে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণী যত মত তত পথ বিশাল হিন্দুধর্মের অন্তর্গত অসংখ্য বৈচিত্র্যময় ধর্মমার্গের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্যকে ঘোষণা করেছে, সামগ্রিকরূপে হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম ও খ্রীষ্টানধর্মরূপী তিন মত পথের মধ্যে নয়।

অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের দু' এক জায়গায় আমরা দেখতে পাই শ্রীঠাকুরই বলেছেন—"আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল—এ মত ভাল নয়। ঈশ্বর এক—এক বই দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে গড্, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে—এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে ওয়াটার, আর এক ঘাটের লোক বলছে পানি—হিন্দু বলছে জল, খ্রীষ্টান বলছে ওয়াটার, মুসলমান বলছে পানি—কিন্তু বস্তু এক। মত—পথ। এক একটি ধর্মের মত এক একটি পথ, ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানা দিক থেকে এসে সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়।"

"বেদ পুরাণ তন্ত্রে, প্রতিপাদ্য একই সচ্চিদানন্দ। বেদে সচ্চিদানন্দ (ব্রহ্ম)। পুরাণেও সচ্চিদানন্দ (কৃষ্ণ রাম প্রভৃতি)। তন্ত্রেও সচ্চিদানন্দ (শিব)। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব।"

আর এক জায়গায় বলছেন শ্রীঠাকুর—"আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি, 'এ কথা বোলো না—আমারই পথ সত্য, আর সব মিথ্যা ভুল।' হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক জায়গায়ই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে আন্তরিক তাঁকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ এধরণের কথা যখনই বলেছেন, তখনই বুঝতে হবে তাঁর নিজস্ব সাধনা ও ভাব অনুসারে তিনি ঐ কথা বলছেন। পূর্বের আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, তিনি যখন মুসলমানদের সাধনার কথা বলছেন তখন আসলে বলছেন সুফীদের সাধনমার্গের কথা, যা বস্তুগত অর্থে হিন্দুদের ত্যাগবৈরাগ্য ভিত্তিক সাধনপ্রণালীর বিশেষত্বে মণ্ডিত। ইহকাল ও পরকালে ভোগসুখই চরম উদ্দেশ্য, আল্লা পুরুষদের ভোগের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সাজিয়ে দিয়েছেন, যদি কিতাব, রসুল ও আল্লাতে ইমান ঠিক থাকে তাহলে হইলোকে এবং স্বর্গেও অনন্ত ভোগসুখ পাওয়া যাবে, নতুবা নরকে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে—এই ধরণের তত্ত্ব সমন্বিত, ভোগবাদ ভিত্তিক, জেহাদ ভিত্তিক ইসলামের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন নি। কারণ, ভোগবাদের পথ ত্যাগপূত সাধনার পথ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। ভোগের পথে ঈশ্বরকে পাওয়ার কথা বা তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের কথা অচিন্তনীয়। সত্যিকারের সুফী সাধকগণ রীতিমত কঠোর ব্রহ্মচর্যসহ সাধনভজন জপধ্যান হোমানুষ্ঠান প্রভৃতি করেন এবং ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হন। এঁরা অধ্যাত্ম

জগতের পথিক। ভগবানকে পাওয়াই এঁদের উদ্দেশ্য। এঁরা ঈশ্বরকে আল্লা নামে ডাকলেও সেই এক সচ্চিদানন্দকেই প্রাপ্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের কথাই বলেছেন মুসলমান ধর্মের কথা বলতে গিয়ে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে দেখা যায় দুটি বিভাগ। একটি ওল্ড টেস্টামেণ্ট এবং দ্বিতীয়টি নিউ টেস্টামেণ্ট। ওল্ড টেস্টামেণ্ট এবং কোরানের মধ্যে প্রভূত পরিমাণ সাদৃশ্য রয়েছে। মূর্তিপূজা পাপ এবং ঐ সব মূর্তিপূজকরা নরকে যাবে। স্বর্গ চরম ও অনন্ত সুখ ভোগের স্থান। নরক চরম ও অনন্ত যন্ত্রণা ভোগের স্থান। ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য অধ্যাত্মপথের কথা সেখানে নেই। নিউ টেস্টামেণ্টে যীশু তাঁর নিজস্ব সাধনার দ্বারা লব্ধ কিছু উপলব্ধির কথা বলেছেন। তাঁর বহুবিধ সিদ্ধাই শক্তিরও প্রকাশ ঘটেছে, যার বর্ণনা সেখানে রয়েছে। কারণ, যীশুর সাধনার কিছুটা ছিল হিন্দু-মতের সদৃশ। স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন—যীশু ছিলেন এসেনী সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁরা ছিলেন ঈশান বা শিবের উপাসক, ভারতীয় নাথ যোগীদের সদৃশ। ঈশান থেকেই ঈশা নামের উদ্ভব এবং যীশুর ঈশা নামে পরিচিতি। আবার তিব্বতের হিমিশ নামক গুহায় যীশুর সাধনা করার বিষয়ে ও ভারতে আগমন বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তিব্বতে ছিল ভগবান বুদ্ধের মতের প্রভাব।

যাইহোক্, সমগ্র বাইবেল ভিত্তিক খ্রীষ্টান মতকে মানতে গেলে দেবদেবীকে মানা চলে না। সেখানে ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা, ঈশ্বরকে পাওয়ার কথা, অধ্যাত্ম পথের কথা বা যোগের কথা নেই। ইহলোকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বর্গেও অনন্ত সুখলাভ জীবনের উদ্দেশ্য। একমাত্র প্রফেট ছাড়া ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি যোগ অন্য কারও হতে পারে না।

সাধারণদের জন্য মূল নির্দেশ পাপ স্বীকার ও প্রার্থনা। ত্যাগ এবং ভোগ দুটি বিপরীত মেরু। ইস্‌লামের মতই খৃষ্টানদেরও মূল লক্ষ্য ভোগ। হিন্দুর মূল লক্ষ্য ত্যাগ। কারণ, ত্যাগের মাধ্যমেই পাওয়া যায় সেই পরম বস্তুকে।

অতএব খ্রীষ্টান সাধনার নামে শ্রীরামকৃষ্ণ যা বোঝাচ্ছেন, তা কিন্তু তাঁর নিজস্ব ত্যাগ, বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য ও কঠোর তপস্যাপূত সাধনা—যার উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে কিংবা চিন্ময়ী শ্রীশ্রীজগদম্বাকে পাওয়া। এই উদ্দেশ্য এবং সাধনা উভয়ই হিন্দুমতের সাধনা ও সাধ্য—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

তাই শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' উক্তিকে যথার্থ মূল্যায়ন সহকারে গ্রহণ করা প্রয়োজন। ঐ বাণী প্রচারের সময় যথেষ্ট সতর্কতার আবশ্যকতা রয়েছে। নইলে ঐ বাণীর তাৎপর্য বিকৃত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যাবে।

'যত মত তত পথ' বাণীটির বিষয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের একটি উল্লেখযোগ্য পত্র রয়েছে। কাশী থেকে ১৮ এপ্রিল, ১৯১৯ শর্বানন্দজীকে লেখা উদ্বোধনে প্রকাশিত সেই পত্রের মূল অংশ এইরূপ ঃ

"ঠাকুরের মত বলা বড় সহজ নয়। আমার মনে হয় সকল ধর্মমতকে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন, "যত মত তত পথ।"

সকল মত তিনি নিজে সাধন করে, এক সত্যে পৌঁছানো যায় অনুভব করে, তবে পূর্বের অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পারমার্থিক সত্য এক অদ্বৈত, যাকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান ইত্যাদি অনেক নামে অভিহিত করা হয়।

যিনি ঐ সত্য (Truth) উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি উহা নিজের

সংস্কার ও রুচি অনুযায়ী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতে বিশেষ নাম দিয়াছেন।

কিন্তু কেহই "পরিপূর্ণ সমগ্র সত্য" কি তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। "তিনি যাহা, তিনি তাহাই"—এই মনোভাবই উপলব্ধিবান ব্যক্তিসকলের চরম সিদ্ধান্ত।

অবস্থাবিশেষে গৌড়পাদের অজাতবাদ, শঙ্করের বিবর্তবাদ, রামানুজের পরিণামবাদ অথবা শিবাদ্বৈতবাদ সকলই সত্য।

আবার এ সকল ছাড়া তিনি অবাঙ্‌মনসগোচরম্‌। ঐ সকল মতবাদের প্রতিষ্ঠাতাগণ (প্রবর্তকগণ) তপস্যা করিয়াছেন এবং ভগবানের বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই নির্দেশে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন।

তাঁহাকে লইয়াই সকল বাদ, কিন্তু তিনি বাদবিচারের পারে। এই সত্যটি প্রচার করাই যেন ঠাকুরের মত বলিয়া মনে হয়।

দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽস্মি, জীববুদ্ধ্যাত্বদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহং, ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।

ইহাই তিনি উত্তম সিদ্ধান্ত বলিয়া বলিতেন। আর চিন্ময় কোলাকুলি কেন হবে না ?

"ন তদস্তি বিনা যৎ স্যাম্ময়া ভূতং চরাচরম্‌"—তিনি ভিন্ন তো কিছুই নাই, সবই তো তিনি। আমরা তাঁকে না দেখেই তো অন্য জিনিস দেখি—নতুবা তিনিই সব। নামরূপ তো, তাঁ থেকেই এবং তাঁতেই! তরঙ্গ, ফেন, বুদ্‌বুদ্‌—জল ছাড়া তো কিছুই না। এতে তোমার বিবর্তবাদ থাক আর যাক।

এ সত্য যে দেখেছে, সে আর মিথ্যা বলতে পারে না। তবে ঠাকুরের এমন অবস্থা হয়ে যেত, যখন তিনি ভাবাতীত হয়ে যেতেন। তখন

নামরূপ থাকত না, তার পারে যেতেন। সে অবাঙ্‌মনসগোচর অবস্থা। তখনও সেই একই আছেন—অদ্বৈত আর কিছু নাই।

সেখানে বিবর্ত কোথায়, অজাতই বা কোথায়? বিবর্ত, অজাত, পরিণাম তাঁতেই হচ্ছে। তিনি মাত্র সত্য। আবার তা থেকে যে জীব জগৎ হচ্ছে, তাও সত্য যদি তাঁকে না ভোলা যায়। তাঁকে ভুলে নামরূপ দেখলেই মিথ্যা হয়ে গেল। কেন? না, তারা থাকে না। কিন্তু যদি তাঁকে মনে থাকে, তবে বুঝতে পারি মাজেরই খোল, খোলেরই মাজ। "ময়া ততমিদং সর্বং," "ময়ি সর্বমিদং প্রোতং" ইত্যাদি তখন যেন বোঝা যায়।

আসল কথা তাঁকে দেখতে হবে। তাঁকে দেখলে আর কিছুই থাকে না। সব তিনিময় বোধ হয়ে যায়।

তাঁকে দেখবার আগে অবধি যত গোল, যত বাদ-বিবাদ। তাঁকে দেখলে সব গোল মেটে। তাঁকে জানলেই নিরাবিল শান্তি।

ঠাকুরের মত অতএব এইরূপ: যে কোন উপায়ে, যা হোক করে তাঁকে পাইতে হইবে। "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে কর"—ইহার অর্থ একবার যদি তাঁকে পাও, তবে তোমার রুচি অনুসারে যে কোন মত পোষণে আসে যায় না। তাঁকে জানলেই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।"
[শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি—সম্পাদক, স্বামী চেতনানন্দ—পৃঃ ১৮৪-৮৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়-কেন্দ্রিক বাণীর মূল তাৎপর্য সমভাবাপন্ন সকল ধর্মকে ঈশ্বরলাভের একটি পথ বলে সুবিজ্ঞাত করা, যাতে প্রত্যেক ঈশ্বরানুসন্ধিৎসু মানুষ তার নিজ নিজ ধর্মপথকে নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে চলবে। স্বধর্মনিষ্ঠা ছাড়া ঈশ্বরলাভ হয় না। এই স্বধর্মনিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করার জন্যই মা ভবতারিণীর নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এত ভাবের সাধনা এবং ঐ অপূর্ব ঘোষণা—যত মত তত পথ। এই

মতগুলি কিন্তু ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক, দেহসুখলাভের উদ্দেশ্য-কেন্দ্রিক নয়—একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীর মুখ্য উদ্দেশ্য হিন্দুদের মধ্যে স্বধর্মনিষ্ঠার যথার্থ প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে অযথা বিভেদের দেওয়ালগুলিকে ভেঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধার উন্মেষ ঘটানো এবং ঐক্যসূত্রের প্রতিষ্ঠা করা। কথামৃতের বহুস্থলে এই কথাই শ্রীঠাকুর বহুভাবে এবং অতি স্পষ্টভাবে বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের বলছেন—"বৈষ্ণবদের একটি গ্রন্থ ভক্তমাল। বেশ বই,—ভক্তদের সব কথা আছে। তবে একঘেয়ে। এক জায়গায় ভগবতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে!"

"আমি বৈষ্ণবচরণের অনেক সুখ্যাতি করে সেজবাবুর কাছে আনলুম। সেজবাবু খুব যত্ন খাতির করলে। রূপার বাসন বার করে জল খাওয়ানো পর্যন্ত। তারপর সেজবাবুর সামনে বলে কি—"আমাদের কেশব মন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না! সেজবাবু শাক্ত, ভগবতীর উপাসক। মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি!"

"শ্রীমদ্‌ভাগবত—তাতেও নাকি ঐ রকম কথা আছে, 'কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমুদ্র পার হওয়াও তা!' সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে।"

"শাক্তরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার ক'রে দেন। শাক্তরা বলে, 'তাতো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী—তিনি কি আপনি এসে পার করবেন?—ঐ কৃষ্ণকেই রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য।"

"নিজের নিজের মত ল'য়ে আবার অহংকার কত! ওদেশে, শ্যামবাজার এই সব জায়গায়, তাঁতীরা আছে। অনেকে বৈষ্ণব, তাদের লম্বা লম্বা কথা। বলে, ইনি কোন্ বিষ্ণু মানেন! পাতা বিষ্ণু! (অর্থাৎ যিনি পালন করেন!) ও আমরা ছুঁই না! কোন্ শিব! আমরা আত্মারাম শিব, আত্মারামেশ্বর শিব মানি। এদিকে তাঁত বোনে, আবার এই সব লম্বা লম্বা কথা।"

"রতির মা রাণী কাত্যায়নীর মো-সাহেব; বৈষ্ণবচরণের দলের লোক। গোঁড়া বৈষ্ণবী। এখানে খুব আসা যাওয়া করতো। ভক্তি দ্যাখে কে! যাই আমায় দেখলে মা কালীর প্রসাদ খেতে, অমনি পালালো!"

"যে সমন্বয় করেছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে লয়ে। যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানা রূপ।

''নির্গুণ মেরা বাপ সগুণ মাহতারী
কাকে নিন্দো কাকে বন্দো দোনো পল্লা ভারী।"

"বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা।"

"বেদে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তন্ত্রে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ শিবঃ—শিবঃ কেবলঃ—কেবলঃ শিবঃ। পুরাণে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ পুরাণ তন্ত্রে আছে। আর বৈষ্ণব শাস্ত্রেও আছে কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন শ্রীরাধিকা গোস্বামিকে গৌরগুণকীর্তন শোনালেন। গান শেষে বললেন—"এ তো আপনাদের (বৈষ্ণবদের) হলো। আর যদি কেউ শাক্ত, কি ঘোষপাড়ার মত আসে, তখন কি

বলবো ? তাই এখানে সব ভাবই আছে—এখানে সব রকম লোক আসবে বলে ; বৈষ্ণব, শাক্ত, কর্তাভজা, বেদান্তবাদী, আবার ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম, নানা মত হয়েছে।"

"তবে তিনি যার যা পেটে সয় তাকে সেইটি দিয়েছেন। মা সকলকে মাছের পোলোওয়া দেন না। সকলের পেটে সয় না। তাই কাউকে মাছের ঝোল করে দেন। যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে।"

"বারোয়াড়ীতে নানা মূর্তি করে, আর নানা মতের লোক যায়। রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, সীতা-রাম, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি রয়েছে আর প্রত্যেক মূর্তির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে। যারা বৈষ্ণব তারা বেশী রাধা-কৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা শাক্ত তারা হর-পার্বতীর কাছে। যারা রামভক্ত তারা সীতা-রাম মূর্তির কাছে।"

আর এক জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—"দেখছো কত রকম মত ! মত, পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ।"

ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন—"এখন উপায় !"

শ্রীঠাকুর বললেন—"একটা জোর করে ধরতে হয়। ছাদে যেতে গেলে পাকা সিঁড়িতে উঠা যায় ; একখানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে উঠা যায় ; একগাছা দড়ি দিয়ে, একগাছা বাঁশ দিয়ে, উঠা যায়। কিন্তু এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে ধরতে হয়। ঈশ্বরলাভ করতে হলে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।"

"আর সব মতকে এক একটি পথ বলে জানবে। আমার ঠিক পথ, আর সকলের মিথ্যা, এরূপ বোধ না হয়। বিদ্বেষভাব না হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা এবং বাণীর মধ্যে লক্ষ্য করার কথা এই যে,

তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন হিন্দুদের বিভিন্ন মতের মধ্যে ঝগড়াটা অকারণ। এই ভিত্তিহীন অমূলক ঝগড়া আসলে হয় অজ্ঞানপ্রসূত, নয় অহংকার প্রসূত। নিজের মতকে বড় করতে গিয়ে অপরকে ছোট করার পেছনে অন্য কোনও যুক্তি নেই। আমার সাধনপথ ভাল, একথা বেশ। কিন্তু তারই পাশাপাশি একথা বলার কি যুক্তি আছে যে, অপরের সাধনপথ মন্দ ? আত্যন্তিকে সব আধ্যাত্মিক মার্গই সেই সচ্চিদানন্দকে লাভ করার পথ। সচ্চিদানন্দ অভিমুখী সব পথ সত্য, যে নামেই তাকে খ্যাত করা হোক না কেন। আর সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে কখনই কোনও একটি রূপে বা ভাবে আবন্ধ করে রাখা যায় না। তিনি যেমন রাম কিংবা কৃষ্ণ কিংবা চৈতন্য হতে পারেন, তেমনি পারেন শিব কিংবা দুর্গা কিংবা কালী হতে। তিনিই তো সব আর সবেতেই তো তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। মতুয়ার বুদ্ধি পরিহারপূর্বক নিজের মতপথে নিষ্ঠা এবং অপরের মতপথে শ্রদ্ধার উপদেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁরই কথায় একটিতে গভীর ভালবাসার নাম নিষ্ঠা। ভগবান এই সব বৈচিত্র্য তৈরী করেছেন রুচিভেদের জন্য, সংস্কার ভেদের জন্য, আধার ভেদের জন্য।

আধার এবং অধিকারী সাপেক্ষ ধর্মমার্গই হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব। ঠাকুর বলছেন, এক মায়ের অনেক সন্তান। যার যা পেটে সয় মা তাকে সেইরকমই রান্না করে দেয়। সবারই পেটে এক খাবার সয় না। বিবেকানন্দ এই কথারই প্রতিধ্বনি করে খ্রীষ্টানদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—সবারই জন্য এক মাপের জামা তৈরী করে রেখে দিলে সবারই তা গায়ে নাও লাগতে পারে। কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে। তাই যার যা মাপ তার গায়ের মত জামা

দেওয়াই স্বাভাবিক যুক্তি। এটাই হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব।

পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুসমাজকে বিশেষভাবে সচেতন করে বলছেন যে, "কোনও লোক হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তাহা নয়, একটি করিয়া শত্রু বৃদ্ধি হয়। ...যদি তোমরা আসিতে না দিতে, তবে কি জড়বাদ, মুসলমান ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, পৃথিবীর অন্য কোনও মতবাদ—কিছুই কি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইতো? ...মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা কত বেশী হিন্দুর বসবাস ছিল, আজ তাহাদের সংখ্যা কত হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কোন প্রতিকার না হইলে হিন্দু দিন দিনে আরও কমিয়া যাইবে, শেষে আর কেহ হিন্দু থাকিবে না। হিন্দু জাতির লোপের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের শত দোষ সত্ত্বেও পৃথিবীর সম্মুখে তাহাদের শত শত বিকৃত চিত্র উপস্থাপিত হইলেও, এখনও তাহারা যে-সকল মহৎ ভাবের প্রতিনিধি-রূপে বর্তমান, সেগুলিও লুপ্ত হইবে। আর হিন্দুদের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সকল অধ্যাত্মজ্ঞানের চূড়ামণি অপূর্ব অদ্বৈততত্ত্বও বিলুপ্ত হইবে। অতএব ওঠ, জাগো—পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিবার জন্য বাহু প্রসারিত কর।" বিবেকানন্দের এই নির্দেশ হিন্দুদের নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রাখার নির্দেশ। সব মত পথ যদি একই হতো তাহলে এই বাণীর কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকতো না।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও বাণীর মূল তাৎপর্য এবং সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্যই হচ্ছে—হিন্দুদের স্বধর্মনিষ্ঠায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। এই স্বধর্মনিষ্ঠায় সুপ্রতিষ্ঠিত না হ'লে অর্থাৎ একটা পথ ধরে একটানা না গেলে গন্তব্যে পৌঁছানো যায় না। তাই তিনি ভগবৎপথের বহুভাবের পথিককে নির্দেশ দিলেন, যে কোনও একটি পথ ধরে এগিয়ে যাও।

কারণ, সব মত সব মার্গই এক একটি পথ। অতএব এটাও পাশাপাশি বলে দিলেন—অপরে যে পথ দিয়ে যাচ্ছে যাক্, তাকেও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবে, তাকে খারাপ বা ভুল বলার কোনও ঔচিত্য নেই। এটাই নিষ্ঠার সঙ্গে উদারতার সমন্বয়।

হিন্দুদের ধর্মদর্শনে আছে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের মধ্য দিয়ে সুবিন্যস্ত জীবনযাপনপূর্বক ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়কে লাভ করার কথা। মোক্ষ বা ঈশ্বরপ্রাপ্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্যের সিদ্ধি। হিন্দুধর্মের বাইরে যে দুটি মতের সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণদেব করেছেন, সে দুটি মতে ঐরকম কোন জীবনদর্শন নেই যার চরম ফল ঈশ্বরলাভ বা ব্রহ্মোপলব্ধি। হিন্দুদের মতে তো—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি। ভগবানকে লাভ করে মানুষ ভগবান হয়ে যায়। হিন্দুদের অবতারও অসংখ্য। এসব ব্যাপার ও দুটি মতে নেই।

তাই আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি—যে দুটি বিজাতীয় মতের তথাকথিত সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণদেব করেছেন, তাঁর সে সাধনার মূল ভাবটি কিন্তু হিন্দুভাব, উদ্দেশ্য—ভগবানকে পাওয়া, চিন্ময়ী জগন্মতাকে পাওয়া, ব্রহ্ম বস্তুকে লাভ করা। অতএব ঐ দুই বিজাতীয় মতের নাম বজায় রেখেও কিভাবে আসল বস্তুটুকু গ্রহণ করতে হয়, সেটাই তিনি দেখিয়েছেন। শিশুর খেয়ালে বালকভাবে অনুষ্ঠিত বিজাতীয় মতের অতি গৌণ ও নগণ্যপ্রায় একটি সাধনার অংশকে বিরাট করে ফলাও ক'রে দেখানোর কোনও প্রয়োজনও নেই, কোন যুক্তিও নেই। মুসলমান বা খ্রীষ্টানরা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রফেট, রসুল, ঈশ্বরপুত্র কিংবা স্বয়ং ঈশ্বর বলে কোনও প্রকারেই মানেন না, মানতে পারেন না। সেক্ষেত্রে ওপরপড়া হয়ে একতরফা হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-ঐক্য

বিধাতা সর্বধর্মসমন্বয়কারীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রজেক্‌ট করার প্রচেষ্টা কিছুটা হাস্যকর, এমন কি আত্মমর্যাদাহানিকর বলেই মনে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশকে ধরতে হবে প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে, দেশকালের পটভূমিতে। বুঝতে হবে তাঁর সাধনা ও বাণীর মূল তাৎপর্য। হিন্দুজাতির ম্রিয়মাণ স্বধর্মনিষ্ঠা, লুপ্তপ্রায় আত্মমর্যাদাবোধ ও হিন্দুত্বের গৌরববোধকে ফিরিয়ে আনার জন্য করতে হবে তাঁর বাণীর রূপায়ণ।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বাণী বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি মারওয়াড়ী ভক্তদের ভক্তি দেখে বলছেন—"খোট্টাদের কি ভক্তি দেখেছ, যথার্থ হিন্দুভাব। এই সনাতন ধর্ম···হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম। ইদানীং যে সব ধর্ম দেখছ এসব তাঁরই ইচ্ছাতে হবে যাবে, থাকবে না। তাই আমি বলি, ইদানীং যে সব ভক্ত তাদেরও চরণেভ্যো নমঃ। হিন্দুধর্ম বরাবর আছে, বরাবর থাকবে।"

অতএব শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী যত মত তত পথের অপব্যাখ্যা করে হিন্দুদের স্বধর্ম নিষ্ঠা থেকে সরে যাবার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সেটা আত্মহননেরই পথ। সেটাকে রোধ করা আবশ্যক। তাই মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণীর প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি ক'রে সমগ্র হিন্দুসমাজকে সম্পাদন করতে হবে দুটি মুখ্য কর্তব্য। প্রথমতঃ নিজ নিজ ধর্মাচরণে এবং জীবনচর্যার সর্বক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে হবে দৃঢ় স্বধর্ম-নিষ্ঠা। দ্বিতীয়তঃ, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতির মাধ্যমে নির্মাণ করতে হবে হিন্দুত্বের সামগ্রিক সত্তার ঐক্যপ্রতিমা। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বহু ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত সেই মহামহিম ঐক্যপ্রতিমার পাদপদ্মে কালে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করবে সমগ্র পৃথিবী। শ্রীঠাকুর কৃপা করে আমাদের সেই শক্তি প্রদান করুন—এই প্রার্থনা।

: স্বামী মৃগানন্দ রচিত কয়েকটি গ্রন্থ ও পুস্তিকা :

ধর্মের রহস্য (দ্বিতীয় সংস্করণ)	টাঃ ২০·০০
(যুক্তিপূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ সহায়ে বৈচিত্র্যময় সনাতন হিন্দুধর্মের সার্বিক আলোচনা-সমৃদ্ধ অনন্য গ্রন্থ)	
হিন্দু—অর্থ ও তাৎপর্য (দ্বিতীয় সংস্করণ)	২·০০
হিন্দুত্বের জাগরণ অনিবার্য (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৩·০০
গোপাল সোনা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	২০·০০

দেবায়তন প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য	শ্রীঅর্চনাপুরী	টাঃ ১৫০·০০
সবার ঠাকুর সত্যানন্দ (তৃতীয় সংস্করণ)	,,	১০·০০
জননী সারদেশ্বরী (চতুর্থ সংস্করণ)	,,	৩০·০০
মহাভারতের কয়েকটি চরিত্র (৩য় সংস্করণ)	,,	৩০·০০
সারদা তত্ত্ব (তৃতীয় সংস্করণ)	,,	৭·৫০
মূর্তিপূজার বিধি ও তাৎপর্য	,,	৫·০০
হিন্দু নারীর ঐতিহ্য	,,	১০·০০
ছোটদের সারদামণি	,,	৭·০০
ছড়ানো মুক্তো (শ্রীঅর্চনা মায়ের বাণী—চতুর্থ সংস্করণ)		২৪·০০
বিবেকানন্দের **হিন্দু** চেতনা (চতুর্থ সংস্করণ)		২০·০০



শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তন, যাদবপুর
১, ইব্রাহিমপুর রোড, কলিকাতা-৩২ ফোন : ৪১২-১৩৭২/০৭৬৯

যত মত তত পথ হিন্দু ঐক্যের ভিত্তি

পাঁচ টাকা